মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম [রহ.]

# বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম

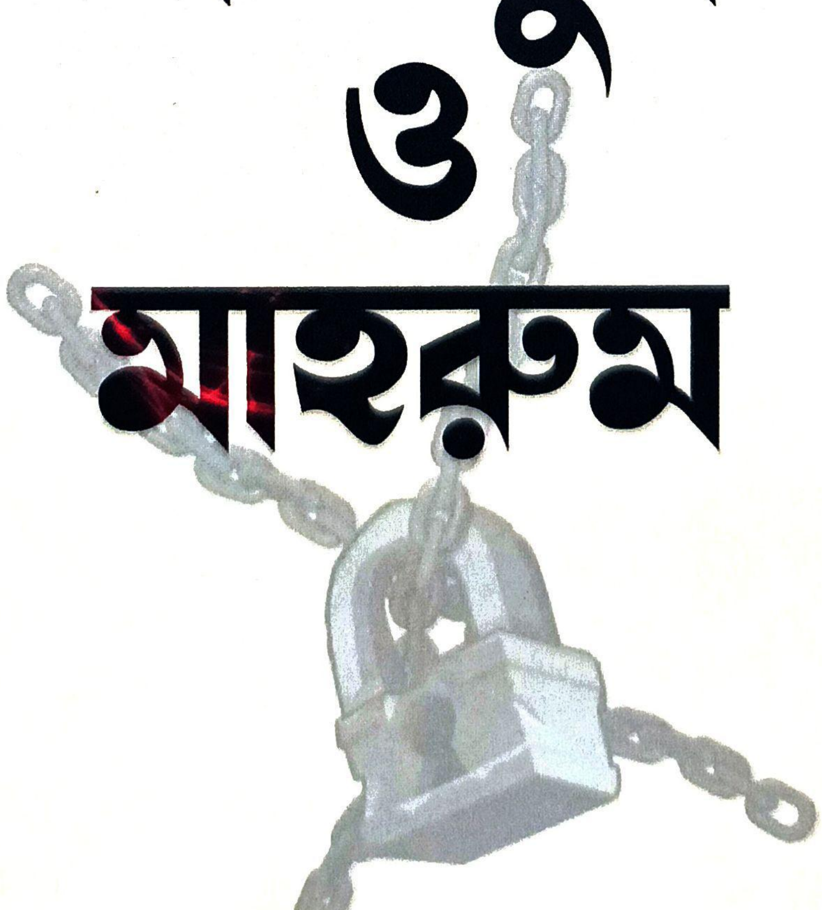

# বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.)

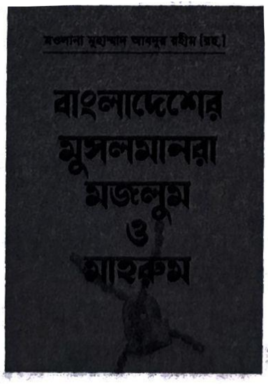


প্রকাশনায়
ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

# বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম ও মাহরুম

আজকের এই বিরাট সমাবেশে উপস্থিত সুধীবৃন্দের নিকট অর্থাৎ আপনাদের নিকট যে কথাগুলো আমি রাখতে চাই, সে কথাগুলোর মূল শিরোনাম বলা যেতে পারে আত্ম-পর্যালোচনা। আমি মনে করি, প্রত্যেক জাতিরী প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা সচেতন, যারা চিন্তাশীল তাদের এটা কর্তব্য যে, তারা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন এবং নিজেদের অবস্থান কোথায় তা পর্যালোচনা করে তারই আলোকে জাতীয় পর্যায়ে একটা দিক-নির্দেশনা খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হবেন।

মনে রাখবেন, এটা একান্তভাবে জরুরি; কেননা যে জাতি আত্ম-সমালোচনা করতে পারে না, নিজের অবস্থার পর্যালোচনা করতে পারে না বা করে না সে জাতি দুনিয়ার বুকে কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সে জাতি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যায়, যেমন তেলহীন প্রদীপ নিভে যায় ক্রমশ। কারণ প্রদীপে তেল দিয়ে জ্বালিয়ে রাখার জন্য কেউ যদি না-ই থাকে তবে প্রদীপ তো নিভে যাবেই।

আমরা বাংলাদেশী নাগরিক। এদেশ সম্পর্কে, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করা, চিন্তা-ভাবনা করা এবং এর সব কিছু নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সকলেরই উচিত বলে আমি মনে করি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আমি একটি বাক্য উচ্চারণ করতে চাই, আর তা হচ্ছে– বাংলাদেশের মুসলমানরা আজ মজলুম ও মাহরুম। মজলুম মানে আমরা জুলুমের শিকার– আমাদের ওপর চালানো হচ্ছে অহর্নিশ জুলুম। আর মাহারুম মানে আমরা বঞ্চিত। বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে আমাদের অধিকার থেকে। অর্থাৎ আমাদের যা প্রাপ্য তা আমাদের দেয়া হচ্ছে না।

আমরা যে মজলুম এবং মাহরুম সাধারণভাবে বলতে গেলে সে চেতনাটুকুও যেন আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ওপর নানাভাবে নানা দিক দিয়ে যে নিপীড়ন চলছে, অত্যাচার চলছে, নির্যাতন চলছে এবং আমাদেরকে যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেয়া হচ্ছে না, বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে আমাদের অধিকার থেকে, এ কথাটি পর্যন্ত আমরা (আমাদের সমাজের লোকেরা) বুঝতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমাদের কোনো চেতনাই নেই। চেতনা যদি থাকতো তবে আমরা জাতীয় জীবনে তার অনেক প্রতিক্রিয়া দেখতে পেতাম। দেখা যেত অনেক বলিষ্ঠ আন্দোলন, অনেক চেষ্টা-সাধনা এবং অনেক সংগ্রাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ইদানীং বাংলাদেশের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যেন এটা মৃত জনপদে পরিণত হয়েছে। সত্যিকার অর্থে নিজ অস্তিত্বে টিকে থাকার মতো কোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগ, কোনো চিন্তা-ভাবনাও আমাদের মাঝে নেই। কচুরিপানার মতো পানিতে ভেসে চলছি– কখনও জোয়ারের টানে সামনের দিকে যাই আবার কখনো ভাটার টানে নিচে নেমে যাই। রাষ্ট্রীয় নেতারা যে দিকে খুশি আমাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যায়, আমরাও সেভাবেই চলতে থাকি। কখনো সামনে কখনো পিছনে। কোনো চেতনাহীন জাতিকে নিয়েই মানুষ হয়তো এভাবে খেল-তামাশা করতে পারে।

জাতির এ ক্রান্তিকালে, আমাদের যে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার আছে– আছে কিছু দায়িত্ব, সে কথাটিও কি আমরা ভুলে যাবো? এ দেশের নাগরিক হিসেবে, সমাজের সদস্য হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক; তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই আমাদের নেই। এ কথা সকলকে মনে রাখতে হবে।

আমি যে বলছি, বর্তমান সময়ে আমরা মজলুম, এর অর্থ– নানাভাবে আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় যে জুলুম করা হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে, যা অত্যন্ত সাংঘাতিক এবং অত্যন্ত মারাত্মক, তা হচ্ছে– আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো আদর্শ, কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। কিসের ওপর ভিত্তি করে এ জাতি চলবে, কোন আদর্শের অনুসারী হবে, তা কেউ বলতে পারছে না। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদেরকে আমাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। যা আমাদের প্রাপ্য, যা আমাদের হক, যা ছাড়া কোনো জাতি চলতে পারে না, পরিচিতি লাভ করতে পারে না– তা আমাদের কেউ দিচ্ছে না।

প্রতিটি জনগোষ্ঠীর, প্রতিটি জাতির একটি নিজস্ব আদর্শ থাকে। জাতির জনগণ সে আদর্শ দ্বারা লালিত পালিত হয়। দেশ তথা রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ সব কিছুই সে আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। দেশে যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে– নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত– সব কিছু তারই আলোকে, তারই আদর্শে গড়ে ওঠে, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আজকে যদি আমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশী জনগণের জাতীয় আদর্শ কী? তবে তার কোনো জবাব দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনারা যারা এখানে সুধী এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রয়েছেন, আপনারা কেউ কি বলতে পারবেন আমাদের জাতীয় আদর্শ কী? বলতে পারবেন না, কারণ সে সম্পর্কে আমাদের কোনো সুস্পষ্ট ধারণাই নেই। কেউ কেউ বলে আমরা মুসলমান, কেউ বলে আমরা বাঙালি আবার কেউ বলে আমরা বাংলাদেশী। আসলে আমরা যে কী, জাতীয়ভাবে তার কোনো ফায়সালা করা হয় নি। তাই এর জবাবও আমরা সত্যিকার অর্থে দিতে পারছি না। আমাদের পরিচিতি নিয়ে, জাতীয় আদর্শ নিয়ে চলছে এক গভীর চক্রান্ত– এটা বুঝার মতো বিবেক-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আমরা নির্বিকারভাবে বসে আছি; কিন্তু কেন?

দেশে যখন কিছুটা মুসলিম চেতনাসম্পন্ন লোকেরা ক্ষমতায় আসে তখন আমাদের ধারণা দেয়া হয় জাতি হিসেবে আমরা মুসলমান। আবার যখন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা হয় বাঙালি– বাঙালি চেতনার ধারক-বাহক, তখন জাতি হিসেবে আমাদের পরিচিত করানো হয় বাঙালি। আবার যখন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় আসন গ্রহণ করে তখন আমাদের পরিচিত করানো হয় বাঙলাদেশী জাতীয়তাবাদী জাতি হিসেবে। অর্থাৎ ক্ষমতাসীনরা

যখন যে চিন্তার অনুসারী হয়, জনগণকে তখন সে হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানোর চেষ্টা করা হয়। এ এক আজব দেশ! দেশের জনগণকে নিয়ে এভাবে এক আজব খেলা শুরু হয়েছে।

যা হোক মুসলিম নামধারী সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক হিসেবে আমরা অবশ্যই বলব, আমরা জাতি হিসেবে মুসলমান। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, এখানকার লোকেরা মুসলমান বলেই ১৯৪৭ সনে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তিকালে আমরা ভোট দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলাম এবং জাতি হিসেবে পরিচিত ছিলাম মুসলমান হিসেবে।

বর্তমানে আমরা মনে করি এবং দাবিও করা হয় যে, আমরা একটি স্বাধীন জাতি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা কতটা স্বাধীন? স্বাধীন বলা হয় কাকে? প্রচলিত নিয়মে স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দেয়া হয় তাতে বলা হয়– যদি কোনো বিদেশী জাতি বা শক্তি দ্বারা কোনো দেশ শাসিত না হয় তবে সে স্বাধীন। আর যদি তার উল্টোটা হয় অর্থাৎ কোনো বিদেশী শক্তি দ্বারা কোনো দেশ যদি শাসিত হতে থাকে তখন সে হয় পরাধীন। এটুকু নিয়ম বা দর্শনের ভিত্তিতে স্বাধীনতার অর্থ করা হয়। কিন্তু আমার কাছে স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে– প্রতিটি জাতির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও ঈমান-আকীদা মোতাবেক জীবন যাপন করার অধিকার পাওয়া। নিজেদের ঈমান-আকীদা অনুযায়ী যদি জনগণ জীবন যাপন করার অধিকার পায়– পায় সুযোগ-সুবিধা তবে তারা স্বাধীন। আর যদি তা না থাকে তাহলে তারা পরাধীন; এক কথায় মজলুম ও মাহরূম।

এ ইতিহাস সকলেরই জানা যে, প্রায় দুশো বছর ধরে আমরা এ অঞ্চলের মানুষ বৃটিশদের গোলাম ছিলাম। ইংরেজরা এ দেশ দখল করে নিয়েছিল আর মুসলমানদের হাত থেকে নিয়েছিল ক্ষমতা কেড়ে। তার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো, এ দেশের আইন-কানুন, এদেশের বিচার-আচার, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুই মৌলিকভাবে ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিল। বিকৃতি যে ছিল না এমনটি বলা যাবে না; তবে মৌলিকভাবে সব জিনিসই ইসলাম অনুযায়ী ছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ইংরেজরা যখন এ দেশ দখল করে নিলো তারপর থেকে তারা একে একে সব কিছুই বাতিল করতে শুরু করে দিল। মুসলমানদের গড়া নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, সভ্যতা-সাংস্কৃতি, এক কথায় যাবতীয় সিস্টেম একেবারে

পাল্টে ফেলল। নাম-চিহ্ন মুছে দিতে লাগলো মুসলিম জাতীয় আদর্শের। আর তার জায়গায় তারা নিজেদের মনগড়া সব সিস্টেম, রীতি-নীতি, শিক্ষাদর্শ চালু করে দিল।

এ দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে ছিল মাদ্রাসা শিক্ষা। সেখানে যে দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হতো তারই আলোকে শিক্ষিত হয়ে এদেশের লোকেরা রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম পর্যন্ত আঞ্জাম দিত। কিন্তু ইংরেজরা এসে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করল। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ, ইউনিভার্সিটি সর্বত্রই নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও কৃষ্টি সভ্যতাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে দিল। তার ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থাই এদেশের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করল। দীর্ঘ দুশো বছর আমাদের ছেলে-মেয়ে, আমাদের বংশধর অর্থাৎ এদেশের মুসলমান ঘরের লোকেরা ইংরেজদের গড়া ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করতে লাগল। ফলে মুসলমানদের নিজস্ব যে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল তার মান ও গুরুত্ব দুটোই হারিয়ে যেতে লাগল।

মুসলমানরা দ্বীনি মাদ্রাসা চালাতে থাকল বটে, কিন্তু জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে শিক্ষার কোনো গুরুত্ব আর রইল না। অন্যদিকে ইংরেজরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাই একে একে চাকরিতে সুযোগ পেল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পেল। এছাড়া যারা ইংরেজদের মনগড়া আইনশাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করল তারাই দেশের বিচার ব্যবস্থার কর্ণধার হয়ে বসলো। ফলে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ক্রমে ক্রমে ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাদের চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী লোকদের নিকট চলে গেল। শুধু তা-ই নয়, ইংরেজদের গড়া ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতো জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক সহযোগিতা দ্বারা আর মুসলমানদের যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলো চালু রাখা হয়েছিল কোনো রকমে গরীব মুসলমানদের দেয়া চাঁদার ওপর নির্ভর করে– খুবই অসহায় অবস্থায়। এ কারণে এ সকল প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত করুণ অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকল। এভাবে মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম-চিহ্ন যা কিছু ছিল একে একে তা মুছে যেতে লাগল আর ইংরেজদের গড়া নিয়ম-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছু প্রচারিত ও প্রসারিত হতে লাগল। এর পরিণতিতে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের জীবনধারা বদলে যেতে শুরু করল। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত সে শিক্ষাই

আমাদের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে চলছে যা ইংরেজরা এদেশে কায়েম করে গিয়েছে।

আমি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে এ কথা বলতে চাই এবং এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানরা মুসলমানিত্ব শিখতে পারে না, আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে চিনতে পারে না, আল্লাহর কালাম পড়তে পারে না, রাসূলে করীম (সা.)-এর হাদীস সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে না, বলতে গেলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, সে শিক্ষাব্যবস্থাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা হিসেবে চালু রয়েছে। এর চেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে। আমি জানি না এ জন্যে কোনো ব্যথা, কোনো অনুশোচনা আমাদের অন্তরে অনুভূত হয় কি না। আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা থেকে মাহরুম করে রাখা হয়েছে– বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। আর অন্যদিকে আপনারা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছেন যে, সেই ইংরেজদের চালু করে যাওয়া আইন-কানুনের ভিত্তিতেই দেশ ও জাতি আজও পরিচালিত হচ্ছে।

আমরা দাবি করি, আমরা স্বাধীন। ইংরেজরা (এবং পাকিস্তানিরা) এখন আর আমাদের দেশে নেই। সাত-সমুদ্দুর ওপার থেকে আসা সাদা চামড়ার লোকেরাও এখন আমাদের দেশ শাসন করছে না। কিন্তু তাদের গড়ে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করছে– তাদের চিন্তা-চেতনা ও চাল-চলন যারা রপ্ত করেছে তারা আজ ইংরেজদের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের ওপরে শাসনদণ্ড চালাচ্ছে। বলতে গেলে, সর্বত্রই ইংরেজদের গড়া নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও তাদের গড়া সিস্টেম চালু রয়েছে। অথচ এরপরও আমরা দাবি করি, আমরা স্বাধীন। একবার নয়, দু' দুবার এ দেশটি 'স্বাধীন' হয়েছে। কিন্তু আসল স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় আমার দৃষ্টিতে এখনও তা আমরা পাইনি, এদেশের মুসলিম জনগণ পায়নি।

আপনারা যদি প্রশ্ন করেন এর নিগূঢ় রহস্য কোথায়? তবে আমি বলবো যে, আমাদের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা মোতাবেক দেশ শাসন করা হচ্ছে না; সে অনুযায়ী আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না, আমাদের সমাজ চলছে না, অর্থনীতি চলছে না, আইন-কানুন চলছে না, বিচার ব্যবস্থাও চলছে না। তাই সত্যিকার অর্থে আমরা স্বাধীন নই। বরং এখন পর্যন্ত সেই পরাধীনতার গোলামী শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। আমাদের এ

পরাধীনতা ও এই গোলামীর শৃঙ্খল ভাঙতেই হবে। এর থেকে রেহাই আমাদের পেতেই হবে। মুসলমানদেরকে তাদের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত আজাদী ফিরিয়ে দিতে হবে; মুক্ত করতে হবে তাদের বিজাতীয় আদর্শের শৃঙ্খল থেকে।

আজ দেশে যে অবস্থা চলছে তা একটা স্বাধীন জাতির জন্যে অত্যন্ত লজ্জাজনক। কেননা দুনিয়ার ইতিহাস এটা প্রমাণ করে যে, বহু দেশ বিদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে। পরে যখন তারা সে দেশ ছেড়ে চলে গেছে তখন সে দেশের নাগরিকরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার কাজ শুরু করেছে ও পরাধীনতার পংকিলতা থেকে নিজদেরকে মুক্ত করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে তা হয়নি। আমরা যে পঙ্কিলতার মধ্যে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম; বরং পরাধীনতার সেই গ্লানি মোছার পরিবর্তে তাদের রেখে যাওয়া ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে ধরে রাখলাম। আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতা, আমাদের আদর্শকে যেভাবে ওরা ধ্বংস করেছে তাতে তো ইংরেজ বেনিয়াদের ওপর আমাদের ঘৃণা জন্মবারই কথা ছিল; কিন্তু তার পরিবর্তে ওদের রেখে যাওয়া খোদাদ্রোহী আদর্শকে গ্রহণ করে নিজেদেরকে আমরা গৌরবান্বিত মনে করছি, ধন্য মনে করছি; আমরা ভুলে গিয়েছি, আমরা মুসলমান।

তাই বলছি, স্বাধীন হয়েও সত্যিকারের স্বাধীনতা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আমাদের প্রাপ্য অধিকার আমাদেরকে দেয়া হয়নি। আর যার যেটা পাওনা সেটা তাকে না দেয়াই হচ্ছে কুরআনের পরিভাষায় জুলুম। তাই বাংলাদেশের মুসলমানরা আজ মজলুম। তাদের যে মৌলিক অধিকার ছিল মুসলমান হিসেবে, তা তাদেরকে দেয়া হয়নি।

আমরা মুসলমান বলেই আমরা ঈমান রাখি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর। এ ঈমান অনুযায়ী আমাদের শাসন-প্রশাসন চালানো হবে; কিন্তু তা হচ্ছে না; এ ঈমান অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়ে তোলা প্রয়োজন হলেও তা হচ্ছে না; বরং এর বিপরীত ঈমান ও আকীদা গড়ে তোলা হচ্ছে। এদেশে যত নিয়ম-নীতি চালু আছে সে সবের একটি একটি করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোথাও আইনগতভাবে, নীতিগতভাবে বা আদর্শগতভাবে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি; সব কিছু ইংরেজদেরই রেখে যাওয়া। তাই আপনাদের কাছে আমি বলতে চাই, আপনারাও একটু

মিলিয়ে দেখুন। বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পর্যায়, প্রতিটি কাজে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে।

ইংরেজরা বিদেশি শাসক ছিল, আমরা ছিলাম ওদের গোলাম। তারা এখানকার বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে কিছু কিছু কাজ করেছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন, তারা রাস্তা-ঘাট করেছে, রেল লাইন তৈরি করেছে, নগর-বন্দর-শহর ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। এগুলো তারা করেছে এদেশের জনগণকে খুশি রেখে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ মজবুত করার জন্যে– শিকড় আরও শক্ত করে প্রোথিত করার জন্যে। তাদের লক্ষ্য ছিল, এদেশের মানুষকে চিরদিন যেন গোলাম বানিয়ে রাখা যায়, তাদের প্রতি আমরা যেন কৃতজ্ঞ থাকি। যাই হোক, এগুলো তো হচ্ছে অতীতের কথা; কিন্তু এখনও কেন তাদের প্রতি আমাদের অনুগৃহীত থাকতে হবে? তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে? এর কী মানে থাকতে পারে? আমাদের কি এ থেকে মুক্তি পাওয়া বা নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় নেই? মুক্তির পথ কি আমরা খুঁজে পাব না?

আসলে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের মনে যে আকুতি থাকা প্রয়োজন, উদ্বেগ থাকা প্রয়োজন, যে চিন্তা-ভাবনা থাকা প্রয়োজন তা হয়তো আমাদের মাঝে নেই। নইলে আজ ভিন্ন এক বিজাতীয় গোষ্ঠীর রেখে যাওয়া পন্থা-পদ্ধতিকে আমরা এতো আপন করে নেব কেন? আমাদের কেন বুঝে আসে না যে, ইংরেজরা যা কিছু এখানে করেছে তার মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করেছে। কিছু মানুষকে তারা সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের নিকটবর্তী করে রেখেছে যেন তাদের মাধ্যমে এদেশের আম মুসলিম জনগণকে দাবিয়ে রাখা যায়; তারা যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কার্যত হয়েছেও তাই। সে কারণে তখন থেকে এদেশের জনগণের কোনো মুক্তি আসেনি। জনগণ যে অন্ধকারে ছিল, যে দুর্দশার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল তা থেকে বের হয়ে আসা তাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি।

দেখুন, ১৯৪৬ সনে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার জন্য এ অঞ্চলের মানুষ পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। এদেশের মানুষ আশায় বুক বেঁধেছিল, পাকিস্তান হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। ১৯৪৭ সনে ইংরেজরা এদেশ থেকে চলে গেল। তারপর থেকে এদেশে বহুবার ভোটাভুটি হয়েছে; কিন্তু কী

পেয়েছে এদেশের মানুষ? ১৯৫৪ সনে সর্বপ্রথম ভোটাভুটি হয়েছে; তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ক্ষমতায় ছিল। ইলেকশনে মুসলিম লীগ পরাজিত হলে যুক্তফ্রন্ট এসে দেশ শাসন করতে লাগল। কিন্তু দেশের সার্বিক অবস্থা একই রূপ থাকল; মৌলিক কোনো পরিবর্তন এলো না। তারপর ১৯৭০ সনে নির্বাচন হয়েছে।[১] বলা যেতে পারে, '৭০ সনের নির্বাচনের ফলেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কি হয়েছে? পাকিস্তান আমলে আমাদের যে অবস্থা ছিল বাংলাদেশ হবার পরও তা-ই অব্যাহত থাকল। এরপর ১৯৭৩ সনেও নির্বাচন হয়েছে। এ সকল নির্বাচন যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায়, এর মাধ্যমে দেশে একদল শোষক শ্রেণি তৈরি হয় এবং কোনো-না-কোনোভাবে এদের হাতেই দেশের ক্ষমতা থেকে যায়। সরকার আসে, সরকার যায়; কিন্তু জনগণের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। মাঝে মধ্যে খুঁটিনাটি কিছু পরিবর্তন আসে; তবে মৌলিকভাবে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এ মৌলিক পরিবর্তন না আসার কারণে এদেশের জনজীবনেও কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসে নি।

ইংরেজরা এদেশে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে গিয়েছিল। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলকথা হলো, দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হবে, বাকী লোকেরা থাকবে দরিদ্র। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছর আমরা এ অর্থনীতিকে কাজ করতে দেখেছি। এখন বাংলাদেশ আমলেও আমরা সেই পুঁজিবাদী অর্থনীতিকেই কাজ করতে দেখছি। সে আমলেও কিছুসংখ্যক লোকের নিকট বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ গচ্ছিত ছিল। তাদেরকে বলা হতো ২২ পরিবার। আদমজী, বাওয়ানী, দাউদসহ আরও অনেকে ছিল এই বাইশ পরিবারের মধ্যে শামিল। তারাই কোটি কোটি টাকার মালিক ছিল আর সাধারণ মানুষ ছিল সর্বহারা বা অতি অল্প বিত্তের মালিক। দেশের বেশিরভাগ টাকা-পয়সা অল্প কিছু লোকের নিকট পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল।

আবার দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা দেখতে পেলাম, এক শ্রেণির মানুষ দেশের সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে যাচ্ছে। সরাসরি ব্যাংক ডাকাতি বা ব্যাংক থেকে ওভার ড্রাফট নিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা লুটে নেয়া হলো। কল-কারখানা একজনে দখল করে নিয়ে অন্যজনের কাছে তা বিক্রি করে দিয়ে তার অর্থ লুট করে নিল। শুধু তা-ই নয়, কল-কারখানায় যে বিপুল

পরিমাণ কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য ছিল, গোডাউন ভেঙে তাও সব লুট করে নেয়া হলো। বিদেশি যা কিছু খাদ্য বা পণ্য সাহায্য আসছিল তার অধিকাংশই বিদেশি বাজারে বিক্রি হতে দেখা গেল। যার ফলে '৭৪-এ এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং বহু মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে মারা গেল। সে সময়েও আমরা এ পুঁজিবাদী মনোবৃত্তিকে কাজ করতে দেখেছি। এক শ্রেণির মানুষ লুটে-পুটে নেবে জনগণের সম্পদ– তারা গরীবদের হক কেড়ে নিয়ে, তাদের বঞ্চিত করে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক হবে এ ধারাবাহিকতা বছরের পর বছর ধরে আমাদেরকে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। সাধারণ মানুষ কোনোদিনই আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এভাবে আমরা এদেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সকল অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে; তাই আমরা মজলুম।

এরপর আমরা একের পর এক ক্ষমতার হাত বদল দেখেছি। এক পর্যায়ে ক্ষমতায় এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাঁর আমলে আমরা একই অবস্থা দেখেছি। পুঁজিবাদ ক্রমশ বিকশিত হয়েছে, সমাজে দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একশত লোকের মধ্য থেকে ২০টি লোক যদি হয় বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক আর বাকি ৮০ জন হয় জাতীয় সম্পদের খুব কম অংশের মালিক, তাহলে দেখা যাবে যে, ঐ বিশ জনই আশি জন লোকের মালিক। এটাই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এ অর্থব্যবস্থাই মানুষে মানুষে পার্থক্য তথা ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ এবং এ কারণটা এখন পর্যন্ত বিরাজমান; বরং বর্তমান সময়ে এ পার্থক্যের মাত্রা আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। এখানে ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, গরিবরা আরও গরিব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। একদিন যারা ছিল জমির মালিক আজ তারা ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। এটা একটা সার্কেল, একটা চাকার মতো ঘুরছে। কে, কখন বেশি টাকার মালিক হয়ে বসবে তা বলা যাবে না। আবার কে কখন একেবারে সর্বহারা হয়ে বসবে তারও ঠিক নেই। এভাবে মানুষের ভাগ্য নিয়ে এক ধরনের জুয়া খেলা হচ্ছে। সকালবেলা আমির তো সন্ধাবেলা ফকির। একেই বলা হয় পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা।

এরপর আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করতে চাই, তা হলো আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ। ইংরেজরা এদেশ দখলের পূর্বে এখানে মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর ইংরেজরা

এদেশে চালু করে নাচ-গানের সংস্কৃতি, মদ খাওয়ার সংস্কৃতি। সাথে সাথে মদের ব্যবসাও তারা চালু করে। দেশভাগের পর এ ধরনের সংস্কৃতি পাকিস্তান আমলে যেমন ছিল তেমনি বাংলাদেশ আমলেও চালু আছে; বরং তার মাত্রা এতো বেশি বেড়ে গেছে যে, গ্রাম-বন্দর ও শহরতলীতে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বত্র মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে আর যুবক-যুবতীরা মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলছে। সেই সঙ্গে চলছে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা স্কুল-কলেজ, ইউনির্ভাসিটিতে, প্রমোদ অনুষ্ঠানে। সিনেমায় অশ্লীল অভিনয়, টেলিভিশন নাটকে সস্তা প্রেমচর্চা, যাত্রা-থিয়েটারে অনৈতিকতার ছড়াছড়ি আজকাল অত্যন্ত বেশি করে হচ্ছে। ফলে নারী-পুরুষের লজ্জা-শরম, শালীনতা, সতীত্ববোধ আজ অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব দেখে মনে হয়, এ জাতিটা আজ এক উচ্ছৃঙ্খল ও জগাখিচুড়ি জাতিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার, যে জাতি চরিত্র হারায় সে জাতি দুনিয়ার বুকে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না; চরিত্রহীন জাতির কোনো স্থান দুনিয়াতে নেই। আজ হোক কাল হোক তারা শেষ হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে। দূর অতীতের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে এ চিত্রই আমরা দেখতে পাবো।

কুরআন আমাদের সামনে অতীত জাতিগুলোর যে ইতিহাস পেশ করেছে তাতে দেখা যায় যে, চরিত্র হারানোর ফলে তারা দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে– মুছে গেছে তাদের নাম-নিশানা। গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পতনও তেমনিভাবে হয়েছে। আর মুসলমানদের যে দুনিয়াব্যাপী রাজত্ব ছিল তার পতনও এ নৈতিক চরিত্রের অধঃপতনের কারণে হয়েছে। বলতে গেলে, আমরা সেই পতনের অবস্থার মধ্যে আছি। পতন সৃষ্টিকারী এক একটা কাণ্ডকারখানা এমনভাবে ঘটে চলছে যা একটি জাতিকে চরমভাবে ডুবিয়ে দিতে পারে। তা থেকে জাতিকে বাঁচানোর কোনো চিন্তা-ভাবনা বা কোনো রকমের চেষ্টা-যত্ন করা হচ্ছে না। শুধু তা-ই নয় বরং তার উল্টোটাই করা হচ্ছে। সংস্কৃতির নামে নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে জাতীয় উন্নতির উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সব নোংরামি না করলে নাকি জাতির উন্নতি হয় না। এজন্য আজকে মেয়েদেরকে খেলার মাঠে যুবকদের সামনে আঁট-সাঁট পেশাক পরিয়ে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বপ্রকার খেলাধূলায় মেয়েদেরকে উপস্থাপন করা হচ্ছে পুরুষের সামনে, কোনো

গোপন স্থানে নয়। শুধু তা-ই নয় তাদেরকে বিদেশে পাঠানো হচ্ছে যুবকদের সাথে একই দলে। আমাদের দেশের মেয়েরা খেলাধূলায় কতটা অগ্রসর বিদেশিদের তা দেখানোর জন্য।

আমাদের এদেশের মুসলিম নারী সমাজের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। তারা নিজেদের ঘরকে নিজেদের বসবাসের কেন্দ্র ও শান্তিময় আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করত। প্রয়োজনে তারা হিজাব পরে ঘরের বাইরেও বের হতো, এমনকি প্রয়োজনে তারা হাট-বাজারও করতো। কিন্তু ফ্যাশন হিসেবে, সৌন্দর্যের প্রদর্শনী হিসেবে, সংস্কৃতির ধারক হিসেবে মুসলমান মেয়েরা ঘর থেকে কখনও বের হতো না। কিন্তু এখন আমরা কী দেখছি। বৃটিশ আমলে আমরা কোলকাতায় থাকাকালেও মুসলমান ঘরের মেয়েরা যে স্টেজে নাচে একথা কখনো শুনতে পাইনি। কিন্তু যেই পাকিস্তান হয়ে গেল অমনি তারা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করল। আর এখন তো মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খলতা আর নগ্নতা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, বায়তুল মুকাররম বা নিউমার্কেট এলাকায় তাদের বেপরোয়া ঘোরাফেরার দরুন পরহেজগার লোকদের পক্ষে চলাচল করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুসলমান হিসেবে আর কত নীচে আমাদের নামতে হবে। তা-ই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এসব কিসের আলামত? সম্ভবত এ কারণেই তা চিন্তা করার সময় এসেছে।

এসব যা কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে আমি এক কথায় বলতে চাই, যে জনগোষ্ঠীটা মুসলমান জাতি নামে পরিচিত, সেই জাতিটাকে জাতি হিসেবে ধ্বংস করে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত চলছে। মুসলিম জাতি যেন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, মুছে যায় যেন তাদের নাম ও নিশানা, মুসলমানরা যেন নিজেদেরকে আর মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে না পারে! তারা যেন গরু-ছাগলের ন্যায় ভিন্ন এক জীব হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকে এবং বেঁচে থেকে খুশি হয়, আন্তর্জাতিকভাবে তারই ষড়যন্ত্র চলছে– তা কেউ বুঝতে পারুক, আর নাই পারুক। সে অনুভূতি, সে চেতনা আমাদের থাকুক আর না-ই থাকুক। জাতি আজ সে দিকেই দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে একথা আজ আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই।

বর্তমান সময়ে আর একটি জিনিস আমি লক্ষ্য করছি; তা হলো আমাদের এই নব্য সমাজে বাঙালি হবার প্রবণতা। আপনারা লক্ষ্য করবেন, বর্তমান সময়ের ছেলে-মেয়েদের নামে প্রায়শ মুসলমানিত্বের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

নামটা তারা বাংলায় এমনভাবে রাখছে যে, ছেলে কিংবা মেয়েটা কোনো মুসলমান ঘরের নাকি কোনো হিন্দু ঘরের নাকি কোনো খ্রিস্টান ঘরের– নাম শুনে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। অথচ মুসলমানদের নামের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এমন একটি স্বাতন্ত্র্য আছে যে, দুনিয়ার যে প্রান্তে সে বসবাস করুক না কেন, নাম শুনেই বোঝা যাবে সে মুসলমান। নামের এই বৈশিষ্ট্যটা যাতে হারিয়ে যায় সে প্রবণতাও আমাদের নব্যদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং একে খুব বেশি করে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে যেন মানুষের মধ্যে সর্বত্র একটা বাঙালি বাঙালি ভাব বিরাজমান থাকে। আর হচ্ছেও তাই। আমরা আসলেই নাকি বাঙালি জাতি! কিন্তু ইতিহাস যা বলে তাতে বাঙালি বলতে কিন্তু হিন্দু জাতিকে বুঝায়।[২] কোলকাতায় বাংলা ভাষাভাষী যে হিন্দুরা বসবাস করে তারা নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দেয়। সুতরাং বাংলা ভাষায় কথা বললে আমাদের বাঙালি হতে হবে এ যুক্তিটা থাকে কোথায়? দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির দিকে খুব কৌশলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সম্ভবত এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু কালচারকে এদেশের মুসলমানদের নিজস্ব কালচার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথ যে গানটি লিখেছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র পজিশন খতম করার জন্যে, সে গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ সে ইতিহাস কারো অজানা থাকার কথা নয়। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল। ঢাকাকে রাজধানী করে ইংরেজরা তাদের কাজের সুবিধার জন্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্তমান বাংলাদেশ এলাকা এবং আসামকে নিয়ে আর একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বানাবার চেষ্টা করেছিল। কেননা বিশাল এ দেশ একজন গভর্নর শাসন করতে পারছিল না। সেজন্য তাদের প্রয়োজন ছিল এটাকে আলাদা করে আর একজন গভর্নর নিয়োগ করা। সে কারণে এখানে গভর্নর হাউজও বানানো হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে এ এলাকার মুসলিমরা প্রাধান্য পেয়ে যাবে এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের উন্নতি সাধিত হবে বলে কোলকাতার হিন্দুরা শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করিয়ে ছাড়ল। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এজন্যে তিনি একটা গানও রচনা করেছিল। সেটাই বর্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত নামে খ্যাত। এ গানটি রেডিও ও টেলিভিশনে প্রায় বাজানো হয়; শুধু তা-ই নয় ছোট ছোট বাচ্চাদের অর্থাৎ প্রাইমারি লেভেল থেকে স্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া

শুরুর প্রাক্কলে সেটি বাজানো হয়। এছাড়া সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে এটাকে বাজিয়ে প্রকারান্তরে একথাই প্রমাণ করা হচ্ছে যে, আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হলেও আসলে আলাদা নই আর আলাদা থাকাও ঠিক নয়। সোনার বাংলা বলতে যদিও আমরা বাংলাদেশকেই বুঝে থাকি; কিন্তু আসলে এ গানটি সমগ্র বঙ্গ প্রদেশকে নিয়েই লেখা। কাজেই সোনার বাংলা বলতে মূলত অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশকেই বোঝানো হয়। অর্থাৎ আমরা যেন সারা বঙ্গ প্রদেশের সাথে মিলিত হয়েই আছি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর এভাবেই প্রথম কুঠারাঘাত হানা হয়। আর এ যে এক বিরাট চক্রান্তের জাল বোনা, বলতে গেলে সে চেতনাটুকুও আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

রেডি-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের সহায়তায় এদেশে মুসলমানদেরকে হিন্দু কালচার গ্রহণ করার জন্য পুরোপুরি উৎসাহ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক ধরনের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আজকাল বাজারে এমনভাবে ছেয়ে গেছে যেগুলো ভারতীয় সিনেমার নগ্ন নায়ক-নায়িকাদের ছবি ছাপিয়ে এদেশের উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের চরিত্রকে পুরোপুরি ধ্বংস করার কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের প্রশাসনযন্ত্র এদিকে লক্ষ্য করার হয়তো প্রয়োজনই অনুভব করছে না।

মানুষকে দুনিয়ার বুকে জীবন যাপন করতে হলে একটি নীতি-আদর্শের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় একটা নিয়ম-নীতির, একটা সিস্টেমের, একটা পদ্ধতির, যাকে সামনে রেখে মানুষ তার প্রতিটি কার্য সমাধা করে। বন্য পশুদের এসবের প্রয়োজন হয় না। তাই জাতি গঠনের জন্যে আমাদের একটি জাতীয় আদর্শ বা মূলনীতি দরকার। কিন্তু যে সিস্টেম বা আদর্শকে আমাদের সামনে রাখা হয়েছে তা এক কথায় বলতে গেলে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতাসীন আওয়ামী সরকার ১৯৭২ সনে সংবিধান রচনা করতে গিয়ে চার দফা মূলনীতি আদর্শ হিসেবে পেশ করেছিল, যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র। এ চারটি মূলনীতি অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমান '৭৩, '৭৪ এবং '৭৫ সনের আগস্ট পর্যন্ত দেশ শাসন করেছেন। এর মধ্যে এদেশবাসী কী দেখতে পেয়েছে? তারা দেখতে পেয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বাস্তব ফলটা কী। মুসলমানদের বাস্তব ও বৃহত্তর জীবনকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে, রেডিও-টিভিতে ইসলামের কোনো

কথা ছিল না। বরং ইসলামের বিপরীত সব চিন্তাধারা, ইসলামের বিপরীত সব ভাবধারা গড়ে তোলা হচ্ছিল। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বস্তুত ধর্মহীনতার কাজ করে যাওয়া হচ্ছিল।

এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পেলাম সমাজতন্ত্রের রূপ। বড় বড় মিল-কারখানা এ দেশীয় এবং পাকিস্তানিরা যা ছেড়ে গিয়েছিল তার সব কিছুই সরকার দখল করে নিল জাতীয়করণের নামে। তারপর যা হলো তা আরও মজার। মানে ক্ষমতাসীনরা এ সকল জায়গায় নিজেদের দলীয় লোক ও নিজেদের আত্মীয়-স্বজন বসিয়ে তাদের হাতে তা পরিচালনার ভার তুলে দিল। একদিকে কল-কারখানা চালানোর অনভিজ্ঞ প্রশাসন, অন্যদিকে কারখানার সম্পদ লুটপাটের কারণে বলতে গেলে প্রায় সব কারখানাই ক্রমে ক্রমে অচল হয়ে পড়ল। এসব অচল কারখানা সচল করার জন্যে ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ওভার ড্রাফট নিয়ে খরচ করা হয়– যা আর কোনোদিন ব্যাংককে ফেরত দেয়া হয়নি।

মুজিব সরকারের এ সমাজতন্ত্রের অর্থ ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের নিজস্ব লোকদেরকে সম্পদশালী করা। ফলে দেখা গে্ল, যারা একদিন কোনো রকমে খেয়ে-পরে জীবন যাপন করতো, তারাই কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসল খুব অল্প দিনের মধ্যে। তারপর বাধ্যতামূলকভাবে সমবায় সমিতি করে দেশের সকল জমি-ক্ষেত আওয়ামী লীগের কর্তাব্যক্তিদের হাতে তুলে দেয়া হলো। তারপর মহকুমাগুলোকে জিলা বানিয়ে তাদের লোকদেরকে গভর্নর করে দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে বসল। এরপর ১৯৭৫ সনের ২৬ মার্চ বাকশাল গঠিত হলো সমাজতন্ত্রকে পুরাপুরিভাবে প্রশাসনিক রূপ দেয়ার জন্যে। এর লক্ষ্য ছিল, দেশের যাবতীয় কল-কারখানার মালিক হবে সরকার। সে সাথে দেশের যাবতীয় জমি-ক্ষেতের মালিক হবে সরকার। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও মালিক সরকার হবে। জনসাধারণ সরকারের ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করবে মজুরির বিনিময়ে। কল-কারখানায় কাজ করবে মজুরি পাবে, কিন্তু তারা কোনো কিছুরই মালিক থাকবে না।

অন্যদিকে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে বেআইনী বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাকশাল নামে একটি মাত্র দল গঠন করা হলো; যেমন করে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হয়ে থাকে। সোভিয়েট রাশিয়ার যেমন একটি মাত্র পার্টি ছিল। সে পার্টির

যিনি কর্মকর্তা তিনিই ছিলেন দেশের সর্বাধিনায়ক। তেমনি এখানে বাকশালের সভাপতি ও চেয়ারম্যান শেখ মুজিব আর দেশের প্রেসিডেন্টও তিনি। শুধু তা-ই নয়, দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র বন্ধ করে দিয়ে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুই-তিনটি পত্রিকা চালু রাখা হলো। ইত্তেফাকের মতো পত্রিকাও সরকারি মালিকানায় দেয়া হয়েছিল। এগুলো হলো এ দেশে সমাজতন্ত্র চর্চার ইতিহাস। কিন্তু সে সমাজতন্ত্র দ্বারা এদেশের জনগণের কোনো কল্যাণ হয়নি বরং জনগণের অধঃপতন হয়েছে, তার ওপর চরম নির্যাতন ও নিষ্পেষণ হয়েছে। বলতে গেলে সে সমাজতন্ত্র চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এদেশের জনগণ তা কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি। পরিণতিতে মুজিব সরকারের পতন হয়েছে।

তারপরে এলেন সেনা শাসক জিয়াউর রহমান। তার সময় থেকে শুরু করে এরশাদের সময় পর্যন্ত আমরা এখানে পুঁজিবাদী শাসন দেখেছি। অনেকটা পাশ্চাত্য ধরনের শাসন।[৩] সেই সঙ্গে কখনো ইউরোপকে অনুসরণ করা কখনো ভারতকে অনুসরণ করা আবার কখনো বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আপন করে নেয়া। ইতঃপূর্বে ঢাকার রাস্তায় মূর্তির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ভাস্কর্যের নামে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুকরণে মেডিকেলের মোড়ে নির্মিত হয়েছে দোয়েল পাখির মূর্তি। তারপর এরশাদ সাহেব সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে পিজি হাসপাতালের পার্শ্বে একটি হরিণের প্রতিকৃতি দাঁড় করিয়েছেন। তার মানে, হিন্দুরা যেমন মাটি দিয়ে মূর্তি বানায়, তেমনি পাথর দিয়ে এ মূর্তি বানানো হয়েছে। এখন ঢাকার রাস্তায় মুসলমানদের চলাচল করতে মূর্তির সাথে পরিচয় না হয়ে আর পারছে না। এটাও যে এক ধরনের শিরক এ অনুভূতি আমাদের মাঝে নেই। তাই এর কোনো গুরুত্বই কেউ দিচ্ছে না। এর চেয়ে মুসলমানদের আর কী অধঃপতন হতে পারে আমার বুঝে আসে না।

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে একটি রাজনৈতিক ধারা চলে আসছে। সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ধারা। রাজনৈতিক নেতারা জনগণের কাছে যান ভোটের জন্যে। জনগণ ভোট দেয় ও নেতারা ভোট নিয়ে ক্ষমতায় যান। পরে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কর্তৃত্ব চালাতে থাকেন। কারণ জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এ অধিকার তারা পেয়ে থাকেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। আসলে ব্যাপারটা কী ঘটে, একটু খতিয়ে দেখুন– যারা নির্বাচিত হয়ে আসেন

তারা ততখানি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হন না দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে, যতখানি যোগ্যতা রাখেন সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারিরা। তারা একাধারে অতি উচ্চ শিক্ষিত ও সরকারের সব বিষয়ের ওপর ট্রেনিংপ্রাপ্তও হয়ে থাকেন এবং সাথে সাথে তারা ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজকর্মের ওপর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও রাখেন। বিভিন্ন সময়ে সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারিদের অবস্থান সহজে পরিবর্তিত হয় না। কখনও কখনও তাদেরকে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি করা হয়, এতোটুকু। অন্যদিকে মন্ত্রী-মিনিস্টার যারাই হন তাদের অনেকে নতুন। হয়তো কাজকর্ম কিছুই বুঝেন না। এ সুযোগে আমলারা তাদেরকে নানাভাবে ভুল বুঝিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো চালাতে চেষ্টা করে। অথচ এর সকল দায়-দায়িত্ব আমলাদের ওপর বর্তায় না। ফল দাঁড়ায় এই, যে কাজ করার ছিল তা করা হয় না আর যা করণীয় নয় তা-ই করা হয়– এভাবে চলে দেশের সেক্রেটারিয়েট।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে সিস্টেম চলছে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে, তাতে এক শ্রেণির মানুষের মধ্যে ক্ষমতাসীন হবার লোভ প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। বলতে গেলে, ক্ষমতার জন্য লড়াই চলছে সর্বপর্যায়ে। এদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, সিভিলিয়ান বুদ্ধিজীবী, উচ্চ সরকারি চাকরিজীবী সকলেই ক্ষমতার জন্য কাঙাল। আর এখন তো সামরিক অফিসারদের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এখন আর ভিন দেশের লোক নয়। তারা আমাদেরই দেশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে আসা আমাদেরই সন্তান, আমাদের জাতিরই অংশ–বাংলাদেশের নাগরিক; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সামরিক বাহিনী গঠন করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে; বিশেষ প্রয়োজনে তাদের গঠন করা হয় এবং তাদের লালন-পালন করা হয়। জাতীয় বাজেটের বলতে গেলে বিরাট অংশ তাদের জন্যেই বরাদ্দ থাকে। তাদের কাজ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা অর্থাৎ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব এ বাহিনীর ওপর ন্যস্ত থাকে যেন বিদেশী কোনো শক্তি আমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে, আমাদের ভৌগলিক সীমারেখার কোনো অংশ যাতে অন্যরা দখল করে নিতে না পারে। অর্থাৎ আমাদের ওপর কোনো বহিঃশক্তি আক্রমণ করলে তার মোকাবেলা করাই সেনাবাহিনীর আসল কাজ। এ

কারণে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, তাদের বেতন-ভাতা, তাদের বাসস্থান, খানা-পিনা এসবও থাকে অতি উচ্চ মানের, যা নাকি জাতির অন্যান্য সাধারণ মানুষের জন্য নয়। মনে রাখবেন, এদের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয় তা কিন্তু এদেশের জনগণের– আপনাদের, আমাদের। অথচ তাদের মাঝেও কখনও কখনও ক্ষমতার লোভ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তাদের মধ্যেও যে কেউ নিজেকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাবে না এমন কথা বলা যাবে না। ১৯৭৫ সনে মেজর-কর্নেলরাই ক্ষমতা দখল করেছিল। সামরিক বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে যারা থাকেন তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা কোনো ব্যাপারই নয়। কমান্ড যার হাতে থাকে সেই ক্ষমতা দখল করতে পারে। বিচারপতি সাত্তার সাহেবের সরকারকে সেনাপতি এরশাদ সাহেব কীভাবে ছিনিয়ে নিলেন তা তো সকলেই জানেন। এই হলো আমাদের দেশের রাজনীতির অবস্থা।

রাজনীতি চিরকাল জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটা বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা জনগণের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল। জনগণ নিজেদের পছন্দমতো এক একটি রাজনৈতিক দলে শামিল হয়ে তাকে সুপরিচিতি করে তুলত আর রাজনীতিবিদরা দলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে রাজনৈতিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে চাইত এই জনগণেরই সমর্থন নিয়ে। এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সামরিক বাহিনী ও সেক্রেটারিয়েটের বড় বড় আমলাদের চক্রান্তের ফলে রাজনীতিটা এখন একটা মারাত্মক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষমতালোভীদের জন্য।[৪] একই ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ক্ষমতাসীন হয়ে রাজনীতির গোটা সিস্টেমটাকেই একেবারে অকেজো করে দেন এবং নানাভাবে ও নানা কৌশলে নিজ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে রাজনীতির চরিত্রটাকেই একেবারে ধ্বংস করে ফেলেন।

তাই রাজনীতি এখন আর জনগণের হাতে নেই আগের মতো। জনগণ ইচ্ছে করলেই কোনো লোককে ক্ষমতাসীন বানাতে পারে না। এখন আর ভোটারদের ভোট দেবার দরকার হয় না। পুলিং বুথে গিয়ে ভোট প্রয়োগের পূর্বেই অনেকের ভোট দেয়া হয়ে যায়। প্রার্থী তার ইচ্ছামতো ভোট পত্রে সীল মেরে আগে থেকেই বাক্সের মধ্যে ভরে রাখে ক্ষমতাসীনদের সহায়তায়। জনগণ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তারা নিজের ইচ্ছেমতো

কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচিত কিংবা নিজের পছন্দনীয় প্রার্থীর পক্ষে রায় জানাতে পারে না। এখন জনগণ যাকে ভোট দেয় সে নির্বাচিত হয় না বরং যাকে ভোট দেয় না সে নির্বাচিত হয়। এতদিন ধরে নির্বাচনের যা-ও একটা সিস্টেম চলে আসছিল সেটাও খতম হয়ে গেছে। তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা একটা বিরাট দেশের প্রতিবেশী। সে দেশের সাহায্য নিয়েই '৭১-এ এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছিল। ফলে আমরা নাকি তাদের কাছে অনুগৃহীত বা ঋণী হয়ে আছি। কিন্তু সে ঋণ তো নগদে শোধ করা হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবেই। পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। তারপরেও তারা দুই-তিন বছরে ৬ থেকে ৭ শত কোটি টাকা এখান থেকে নিয়ে গেছে লুটপাট করে। তা দিয়েও নাকি আমাদের ঋণ শোধ হয়নি। এখনও প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে। এও নাকি আমাদের সেই ঋণ শোধ করার জন্য লাগছে। শুধু তা-ই নয়, এরপরেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কথামতো ওঠা-বসা করতে হবে। আজকে এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সামনে নতজানু ভূমিকা গ্রহণ না করলে নাকি এদেশের শাসক হওয়া যায় না আর থাকাও যায় না।

আপনারা নিশ্চয়ই তালপট্টি সমস্যার কথা জানেন। তৎকালীন জাতীয় সংসদে জিয়া সরকার শ্বেতপত্র দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, সেটা আমাদের দেশেরই অংশ এবং তাকে কিছুতেই বিতর্কিত স্থান বলা যাবে না। কিন্তু পরবর্তী সরকার আমাদের বলেছে যে, ওটা বিতর্কিত। তখন থেকে সরকার এত নীতি স্বীকার করে আছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে, জবাই করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত– সে সম্পর্কে কোনো প্রতিবাদ করলে বলা হয় যে, ওটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমাদের এ ভূখণ্ডটি একটি মুসলিম দেশ। কিন্তু আমাদের ওপরে ক্ষমতাসীন হয়ে মুসলিম হিসেবে তাদের যে চরিত্র থাকা দরকার তা আমরা তাদের মাঝে দেখতে পাই না।

এই ঢাকা শহরে রাতের বেলা এমন সব কাণ্ড ঘটে থাকে যে, একটি মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচয় দিতে আমাদের লজ্জা হয়। রাত-দুপুরে যখন সাধারণ মানুষ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন ঢাকার আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। তখন এ শহরেরই অন্যদিকে এক জাগরণ শুরু হয়। আর তা হলো বড় বড় হোটেল-ক্লাবে জুয়া খেলা আর মদের আডডা। শুধু কি তাই, সেখানে সব বড়

বড় টাকাওয়ালা আসে তাদের গাড়ি নিয়ে। শোনা যায়, সে গাড়ির চাবিগুলো থাকে একটি টেবিলের উপরে ছড়ানো ছিটানো। এরপর চলে নাচ-গান আর মদ্যপান। সেখানে একের স্ত্রী অপরের গলা জড়িয়ে নৃত্য করে। স্বাধীনতা দেয়া হয় প্রতিটি লোককে যে যার ইচ্ছামতো চাবি তুলে নিতে পারে। সে চাবি দিয়ে যার গাড়ি খোলা যাবে এবং সে গাড়িতে যে স্ত্রীলোকটি থাকবে ঐ রাতের জন্য সে স্ত্রীলোকটি তার। এ ঢাকা শহরে এসব কিছু হচ্ছে এক ধরনের এলিট শ্রেণির মধ্যে। একজনের বউ অন্য জনের গলা জড়িয়ে না নাচলে নাকি তাদের প্রেস্টিজ থাকে না। এভাবে সমগ্র জাতিকে নৈতিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে খতম করে দেয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় আদর্শের দিক দিয়ে, ঈমানের দিক দিয়ে কী থাকবে এ জাতির– আর আছেই বা কী?

আমাদেরকে বলা হয়, আমরা গরিব জাতি। আর গরিবির সুযোগ নিয়ে দেশজুড়ে চলছে জন্মনিয়ন্ত্রণের অভিযান। এ অভিযান হচ্ছে আসলে যুবক-যুবতীদের চরিত্র ধ্বংসের অভিযান। যুবতী নারী বা অবিবাহিত নারী পর পুরুষের সাথে মেলামেশার সবচেয়ে বড় বাধা হলো গর্ভবতী হওয়া। এর থেকে সে যদি নিরাপত্তা লাভ করে আর তখন যদি তার আল্লাহর ভয় না থাকে তবে কে তাকে নষ্টামি আর ব্যভিচার থেকে বাঁচাতে পারে, বলুন? তাই আজকে দেখা যাচ্ছে অন্যায়-অপরাধে সমাজ ভরে গেছে। এ দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন আমরা, এদেশের জনগণ।

তাই আমি প্রথমে যে বলেছি, এদেশের মানুষ মজলুম, এদেশের মানুষ মাহরুম, সেটা অত্যন্ত প্রকটরূপে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী? আমরা মুসলমান হয়ে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকব এবং দেশটাকে রসাতলে যেতে দেবো; দেশ যদি রসাতলে যায় আমরা কি তার থেকে বাঁচতে পারব? এদেশের ধ্বংস মানে আমাদেরও ধ্বংস। আমাদের যদি বাস্তবিক কিছু চেতনা থেকে থাকে, তবে এ অবস্থা সম্পর্কে এখনই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

এখানে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে দেশের সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পরিধি কতদূর পর্যন্ত? বলতে গেলে নির্বাচন পর্যন্ত এবং তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাদের মনের কামনা-বাসনা, তাদের চিন্তা-চেতনা বা চেষ্টা-সাধনা, আন্দোলন সব কিছুই নির্বাচনকে নিয়ে। তাদের কাছে নির্বাচন এমনই এক জিনিস যে, সেটা হয়ে গেলে এ জাতির, এ দেশের আর কোনো

সমস্যা থাকবে না। সকল সমস্যার সমাধান এনে দেবে নির্বাচন। তাই তারা বলেন নির্বাচন দাও। তাতে জনগণ যাকে ভোট দেবে সে নির্বাচিত হবে এবং সে-ই ক্ষমতায় যাবে। কিন্তু সেই যে নির্বাচনের একটা সিস্টেম ছিল সেটাকেও একেবারে অর্থহীন করে দেয়া হয়েছে- সে সম্পর্কে এই নির্বাচনপন্থীদের বুঝ আসে নি। আসল কথা হচ্ছে, যিনি ক্ষমতায় থাকবেন পাল্লা তার দিকেই ভারী থাকবে, তাতে প্রশাসনে যতোই রদবদল করা হোক না কেন। যে কোনো মূল্যে তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করবেন, এটা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ।

তাই এটা আজকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার কাঙ্ক্ষিত হাত বদল আর সম্ভব নয়। এর ওপর রয়েছে বিদেশী প্রভুদের ইশারা-ইঙ্গিত। তাদের মতামতেরও বিরাট একটা প্রভাব এ নির্বাচনের ওপর পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, তাদের মনঃপূত দল বা ব্যক্তিকে নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হয়। তাই আমি আবার বলছি, যে ভোটাভুটির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হতে বা কাঙ্ক্ষিত দল নির্বাচিত হতে পারত সেটা এখন আর নেই। সেই সিস্টেমটাও বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে আমি সকলকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছি। কিন্তু গণতন্ত্র নামক এক অন্ধ জাহিলি ব্যবস্থা এমনভাবে আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে, এর থেকে কী করে নিস্তার পাবো আমার জানা নেই।

এটা জনগণকে আজ পর্যন্ত কোনো কল্যাণ এনে দিতে পারেনি। তারপরও কী এক অন্ধ মোহে আমরা পড়ে আছি। এই ধোঁকাবাজি আর প্রতারণার সিস্টেম ইংরেজরা আমাদের দেশে চালু করে গেছে, যেন এদেশের মানুষ চিরদিন ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারে। এমনকি ইসলাম কায়েম করার জন্যও তারা যেন একেই একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে। কেননা এটা গ্রহণ করলে আর কোনোদিন ইসলাম কায়েম হবে না। মানুষ ক্ষমতাসীন হবার জন্যে যুদ্ধ-সংগ্রাম করতে থাকবে এবং এ কাজ নিয়েই তারা সদা ব্যস্ত থাকবে; ফলে আসল কাজ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। ইংরেজদের তৈরি এ বুদ্ধির ফাঁদে আমরা পা দিয়ে বসে আছি। পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্রের সাহায্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। কিন্তু ইসলাম কি গায়রে-ইসলামী পন্থায় কায়েম হতে পারে? আসলে এক বিরাট ধোঁকার মধ্যে আমরা এখনও পড়ে আছি।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা এ রকমই। আমিও অন্যান্যদের মতো এদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম কায়েমের চেষ্টা করেছি। আমার জীবনের প্রথম ভাগ, জীবনের প্রধান অংশ– যেটা কর্মতৎপরতার অংশ– সেটা আমি ঐ কাজেই ব্যয় করেছি। আমি অবশ্য ১৯৭০ সনেই আমার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছিলাম যে, পাশ্চাত্যের এই ধর্মহীন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে কখনও ইসলাম কায়েম হতে পারে না। এ কথা আজ মানতে হবে, সেদিন এ ব্যাপারে কোনো বিকল্প ধারণা আমাদের মাঝে ছিল না বলে ঐ প্রক্রিয়া আমরা অবলম্বন করেছিলাম। আমাদের সামনে সহজ হিসেব ছিল যে, নির্বাচন করবো– জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবো এবং প্রথম নির্বাচন, দ্বিতীয় নির্বাচন ও তৃতীয় নির্বাচনের পরে এমন একটি সময় আসবে যখন আমরা সংসদে শতকরা ৫৫টা সিট পাবো। এভাবে সংসদে মেজরিটি হয়ে একদিন ইসলামী হুকুমত কায়েম করে ফেলবো।

আমার জীবনের এ অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে, আমরা একটা চরম প্রতারণার মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছি। একটা মরীচিকার পিছনে আমরা ছুটে চলছি অনবরত। মনে করছি– এই হচ্ছে, এইবার হয়ে যাবে, এভাবে এক ধরনের নেশা আমাদের পেয়ে বসেছে। আজ এর বিরুদ্ধে কথা বললে এক শ্রেণির লোক বলে, এ লোকটা গণতন্ত্রই মানে না। গণতন্ত্র না মানাটাই যেন একটা বড় অপরাধ। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, গণতন্ত্র– কিসের গণতন্ত্র? কে দিয়েছে গণতন্ত্র? এটা কি আল্লাহ দিয়েছেন না তাঁর রাসূল (সা.) দিয়েছেন? এ পদ্ধতি তো কখনো আল্লাহর রাসূল (সা.) দেন নি।

আসলে যে প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে নির্বাচন হচ্ছে, যে সিস্টেমে লোকদের ভোট নেয়া হচ্ছে, এটা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন ইহুদীদের তৈরি। যদিও বলা হয়, আব্রাহাম লিংকন এ থিউরিটা দিয়েছে, কিন্তু মূল ব্যাপারটা তা নয়। আমি অন্যান্য বক্তৃতায় এর ইতিহাস বর্ণনা করেছি বহুবার। মূলত এটা ইসলামী চেতনা ও ইসলামী লক্ষ্যকে ব্যাহত করার একটা মস্ত বড় হাতিয়ার। এটা ব্যর্থ করে দিয়েছে পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনকে এবং দুনিয়ার যেখানেই এ পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করা হবে সর্বত্র ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। যারা সত্যিকার ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে চায় তাদেরকে আমি চিরদিনের জন্য নিশ্চয়তা দিতে পারি– এ পথে ব্যর্থতা ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না।

এবার আমি তাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই, যারা বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত করতে চান। তাদের জন্যে একটিমাত্র পথ খোলা রয়েছে: তা হলো, এদেশের মুসলমানদেরকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সক্রিয় এবং জাগ্রত করে গণ-অভ্যুত্থান ঘটানো– এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এজন্য জিহাদ, শাহাদাত হচ্ছে অনিবার্য স্তর। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে করীম (স.)-এর ইতিহাস এবং অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ইতিহাস গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস, নির্বাচনের ইতিহাস নয়। আমি সে ইতিহাসের দিকে আপনাদের দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতে বলছি।

রাসূলে করীম (সা.)-এর দাওয়াতে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান তৈরি হয়েছিলেন মক্কায় এবং আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে। আল্লাহর হুকুমে তিনি যখন সকল মুসলমানকে মদীনায় হাজির হতে নির্দেশ দিলেন, সাথে সাথে ঐ মুসলমানরা বহু কষ্টে মদীনায় গিয়ে হাজির হলেন। ইতঃপূর্বে সেখানকার জনগণ ইহুদী বংশের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে রাজা বানাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেজন্য তারা রাজমুকুটেরও ব্যবস্থা করেছিল। ঠিক এ সময়ে রাসূলে করীম (সা.)-এর নেতৃত্বে মদীনায় যে মুসলিম জনসমাবেশ হলো তা দেখে ঐ এলাকার জনগণ হতচকিত হয়ে গেল। এর ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে রাজা বানানোর সমস্ত প্ল্যান প্রোগ্রাম বানচাল হয়ে গেল। অচিরেই এক বিরাট মুসলিম জাগরণ– মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো এবং সে শক্তির মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না ভেবে ইহুদীরা উবাইকে রাজা বানানোর পরিবর্তে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে মদীনা সনদে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলো। ফলে মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্ব এবং তার সুপ্রিমেসি প্রতিষ্ঠিত হলো। তাই নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি, এটি একটি গণঅভ্যুত্থানই ছিল, আর কিছু নয়। সুতরাং আজকে আমাদের সে পন্থায়ই কাজ করতে হবে। এটাই হলো ইসলাম কায়েমের নবুয়্যতী পন্থা। এর মাধ্যমেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এরপর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তা হচ্ছে, আমরা মুসলমান আর মুসলমানদের জীবনাদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম অনুযায়ী তাই আমাদের জীবন যাপন হওয়া উচিত, কিন্তু তা হচ্ছে না। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, শাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য–

আমাদের রাজনীতি-অর্থনীতি সব কিছুই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া উচিত; কিন্তু তা হচ্ছে না। এর কারণ মুসলমান হিসেবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের পালন করার কথা ছিল তা আমরা করিনি। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য যদি আমরা পালন করতে চাই তাহলে প্রয়োজন হবে রাজনৈতিকভাবে এ কথা স্বীকার করে নেয়া যে, এদেশের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ– কোনো মানুষ নয়। এদেশের কোনো মৌলিক আইনের উৎস জনগণ নয়, পার্লামেন্ট নয়, বরং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নাতে যে আইন আছে সে আইনগুলোকেই জারী করতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং তাকেই এদেশের মৌলিক আইন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সে অনুযায়ী সরকার চলবে, বিচার ব্যবস্থাও চলবে। বর্তমান সময়ে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে তাকে খতম করে দিয়ে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালু করতে হবে– যা পুঁজিবাদও নয় সমাজতান্ত্রিকও নয়– অথচ প্রত্যেকটি মানুষের তা মৌলিক অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমরা কুরআন ও হাদীসে যে অর্থনীতি দেখতে পাই তাতে প্রতিটি মানুষের খাওয়া, পড়া, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা– এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। দুনিয়ার অন্য কোনো অর্থনীতি– তা পুঁজিবাদই বলুন আর সমাজতন্ত্রই বলুন– নাগরিকদের এ পাঁচটি মৌলিক অধিকার স্বীকার করতে রাজী নয় এবং কখনও তা করেও নি। দুনিয়ার ইতিহাসে শুধু ইসলামই ঘোষণা করেছে যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থা যেখানেই হবে সেখানে প্রতিটি নাগরিক এ পাঁচটি জিনিসের মৌলিক অধিকার পাবে। যদি নিজের অর্থ উপার্জন দ্বারা ব্যক্তির ঐ পাঁচটি অভাব পূরণ হতে পারে তবে ভালো। আর যদি সে তা না পারে– এ পাঁচটি জিনিসের কোনো একটি থেকেও যদি সে বঞ্চিত থেকে যায়, তা হলে সমাজ ও রাষ্ট্র তা পূরণ করে দেবে; তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। এ ব্যবস্থা কেবল ইসলামই দেয়– কুরআন-সুন্নাহই নিশ্চিত করে। এ ব্যবস্থায় ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব বানানোর কোনো সুযোগ নেই; বরং ধনীকে আরও ধনীর হবার সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং গরীবকে আরও গরীব ও নিঃস্ব হবার পথ বন্ধ করে দেয়। এমনকি এ ব্যবস্থায় গরিব ক্রমে ক্রমে সচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এভাবে ধনী ও গরীবের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান তা ছোট হয়ে

আসে। ফলে সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মৌলিক অধিকার নিয়ে খেয়ে পরে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে পারে। এমন একটা সুন্দর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শুধু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া সম্ভব। সে ধরনের একটি ব্যবস্থা এদেশের জনগণের একান্তভাবে কাম্য; কিন্তু তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

আমি ইতঃপূর্বে আপনাদের সামনে নৈতিক অবক্ষয়ের কথা আলোচনা করেছিলাম। দেশে কত শাসক এলো আর গেল; কিন্তু কেউই জনগণকে এ থেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। এই যে দেশে মদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে সেটাকে বন্ধ করবে কে? কখনও যদি সমস্যা দেখা দেয় তবে হয়তো একটা অর্ডিন্যান্স জারি করা হবে। তাতে প্রকাশ্যে হয়তো মদ্যপান করা হবে না; কিন্তু গোপনে প্রচুর পরিমাণ মদ খাওয়া হবে– তা রোধ করা বা বন্ধ করার ক্ষমতা কার আছে? কেননা শুধু আইনের দ্বারা, শুধু শাসন-দণ্ডের দ্বারা, সরকারি প্রশাসন দ্বারা আইনকে পুরোপুরি কার্যকর করা যায় না– কার্যকর করা সম্ভবও নয়। এটা মানুষের প্রকৃতির বিরোধী। কেননা মানুষ যদি বুঝতে পারে যে সে ধরা না পড়লে শাস্তি হবে না। তাহলে সে গোপনে এমনভাবে কাজ করবে যেন ধরা না পড়তে হয়। এছাড়া আইন কার্যকর করার জন্য যে প্রশাসন আছে– যেমন পুলিশ বিভাগ, দুর্নীতি দমন বিভাগ, সি.আই.ডি, ইত্যাদি– যাদের দ্বারা আপনি দোষী ব্যক্তিকে ধরবেন, শাস্তি দেবেন তাদের দুর্বলতার কারণেও অপরাধীরা বেঁচে যায়। প্রশাসন যন্ত্র যদি একই দোষে দোষী হয় তাহলে স্বভাবতই তারা কোনো দোষী ব্যক্তিকে ধরবে না বা কাউকে শাস্তি দেবে না। ফলে দোষী ব্যক্তিরা রেহাই পেয়ে যাবে, নিষ্কৃতি পাবে এবং তারা আরও বেশি করে খারাপ কাজ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই কেবল আইন প্রয়োগ বা আইনের শাসন দ্বারা অপরাধ দমন করা সম্ভব নয়।

অপরাধ দমন করতে হলে, তাকে প্রতিরোধ করতে হলে মানুষের মাঝে ঈমানের জাগরণ তুলতে হবে। তাদের মধ্যে এ চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে যে, আমরা মুসলমান আমাদের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ, কোনো অন্যায় অশ্লীল কাজ হতে পারে না হওয়া উচিত নয়। আমাদেরকে একদিন স্রষ্টার সামনে দাঁড়াতে হবে এবং যাবতীয় কাজের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে; এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তাই আমাদের সকলের মাঝে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে জনগণ অন্যায়ের মোকাবেলায়

ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। মনে করুন, কোনো একটি গ্রামে যদি কিছু লোক অসামাজিক কোনো কাজে লিপ্ত হয়, যেমন ধরুন মদের আড্ডা বা ব্যভিচারের আড্ডা বসায় আর তখন গ্রামের লোকেরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাহলে ঐ লোকেরা কোনো খারাপ কাজ করতে সাহসই পাবে না। আর যদি গ্রামের জনগণ চুপচাপ বসে থাকে, খারাপ কাজের বিরুদ্ধে কোনো কিছু না-ই বলে বা তাদের মধ্যে যদি অন্যায়ের প্রতিরোধ করার মতো শক্তি না থাকে তবে সমাজ যে অন্ধকারে তলিয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্ততপক্ষে কোনো একটি এলাকার বেশিরভাগ জনগণের মধ্যে চেতনা গড়ে তোলা যায় যে, আমরা অন্যায় করবো না, অন্যায় হতেও দেবো না– তবে সে এলাকাটা অন্যায়-অপরাধমুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

শুধু পুলিশী ব্যবস্থা দিয়ে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা কখনও সম্ভব নয়। এ কথাটির প্রমাণ আজ আমরা বর্তমান সমাজ থেকেই পেতে পারি। এছাড়া আমাদের দেশে দুর্নীতি দমন বিভাগ রয়েছে দুর্নীতি দমন করার জন্য। পুলিশ বিভাগ রয়েছে চোর-ডাকাত ধরার জন্যে। এমতাবস্থায় তো দেশে দুর্নীতিও থাকার কথা নয় আর চোর-ডাকাতও থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই? দিন দিন এসবের সংখ্যা বরং বেড়েই চলেছে। তাহলে এর মূল কারণ কী? কারণটা হচ্ছে, আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে কাজ হওয়া দরকার ছিল তা হচ্ছে না অর্থাৎ একটি জাতিকে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে আদর্শ কার্যত আমাদের নেই।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা যখন চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন সর্বপ্রকারের পাপাচার, নির্যাতন, শোষণ, ব্যভিচার, শিরক, মূর্তিপূজা ইত্যাদি পঙ্কিলতার মধ্যে তারা ডুবে ছিল। আবার এই এরাই যখন পড়ল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর আদর্শকে যখন তারা গ্রহণ করল, তখন তাদের মাঝে পরিবর্তন আসতে শুরু করল এবং আরবরাই যখন ঐক্যবদ্ধ হলো, মদীনা নগরীতে তখন একটা পবিত্র সমাজ গড়ে উঠল। সে সমাজে পাপ আর দুষ্কৃতি কোনো স্থান পেল না। যখনই আল্লাহর তরফ থেকে কোনো কিছু নিষেধ করা হয়েছে– হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, কার্যত তখনই তা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা আর হতে পারেনি। যে

আরবরা সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে পরস্পর মারামারি করত– বংশানুক্রমে যুদ্ধ চালাত– এই আদর্শ গ্রহণ করার ফলে তাদের মাঝে এমন এক পরিবর্তন এল যে, তারা পরের জিনিস খেতে বা নষ্ট করতে এক বিন্দু প্রস্তুত হতোনা। এমন এক অবস্থা দাঁড়াল যে, তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি গিয়েও কিছু খেতে সহজে রাজী হতো না শুধু এই ভয়ে যে, এটা দ্বারা পরের হক খাওয়া হয় কি না? এটা জায়েয কি না? তারা এমনভাবে সচেতন থাকত যে, তাদের দ্বারা এমন কোনো কাজ যেন না হয় যেটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এভাবে তাদের মাঝে একটি বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। আসলে এ সব কিছু সম্ভব হয় তখন, যখন জাতির জীবন একটি আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের দেশের শাসকরা– এতদিন পর্যন্ত যারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করে এসেছেন– তারা যেহেতু সকলেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে তারা তেমন কিছুই জানে না, আর ইসলামী আদর্শকে তারা অনুসরণও করে না। ফলে এ সম্পর্কে তাদের চেতনা একেবারেই কম। তাই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠন করতে তারা রাজী নয়, বরং ইসলামী আদর্শকে এ জাতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সর্বপ্রকারের চেষ্টা ও আয়োজন তারা করে চলছে।

এর একটি কারণ হলো এই যে– ইসলামী আদর্শের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস নেই। আর যে আদর্শের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই সে আদর্শকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়াই হচ্ছে সমাজ থেকে, রাষ্ট্র থেকে ক্রমে নিজদেরকে অপসারণ করে নেয়া এবং সে আদর্শের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে– তার প্রতি যাদের পূর্ণ ঈমান আছে– তাদেরকে স্থান করে দেয়া। যে ক্ষমতার জন্য মানুষ এতো কিছু করে সেখান থেকে নিজকে সরিয়ে এনে কেউ কি অপরকে রাস্তা করে দেয়? নিজের কবর কি কেউ নিজ হাতে তৈরি করে? তাই দেখা যায়, মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব আজ ধ্বংসের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। এ জাতিকে এ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে আসছে না। মুসলমান হয়েও জাতি হিসেবে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠা করার কোনো তাগিদ তারা অনুভব করছে না। এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ– এর চেয়ে বিবেকহীনের মতো কাজ আর কী হতে পারে?

এ জাতি কেমন করে বাঁচবে আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন। একটু বিবেচনা করে দেখুন, এর ভবিষ্যত কী? দেশজুড়ে একটা লুটপাটের

প্রতিযোগিতা চলছে। যে যেভাবে পারছে– যতখানি পারছে জাতীয় সম্পদ লুটছে। অফিস-আদালতে যেখানেই যান না কেন ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হচ্ছে না। কোনো কাজ আপনি পাবেন না। বলতে গেলে এক ধরনের শোষণ চলছে সমাজে। যে কাজ স্বাভাবিকভাবে হবার কথা ছিল, সেটা হচ্ছে না; অর্থাৎ আপনাকে আপনার হক থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। দুর্বলের ওপর চলছে নির্যাতন, চলছে নিষ্পেষণ। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই চলছে দিন ও রাতে। মারামারি, কাটাকাটি, খুন-খারাবি– কী নেই এখানে? জীবনের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই এ সমাজে। কে, কখন কাকে মেরে দেবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ হলো আমাদের সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থায় কোনো জাতি কি দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে পারে? আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এভাবে যদি চলতে থাকে, কেউ যদি এর হাল না ধরে তবে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জীবনে অনেক দুর্দশা নেমে আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে দেশের নিকট অতীত ও বর্তমান অবস্থার একটা চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, আমাদের কী প্রাপ্য ছিল, কী আমরা পাইনি, কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে, কী কীভাবে আমাদের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে এ সব খোলামেলা বলেছি। আমি আশা করি, দেশের সকল চিন্তাশীল নাগরিক, সচেতন ব্যক্তি এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং নিজেদের করণীয় সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কারণ দেশের প্রতিটি নাগরিক ও মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের দ্বীনি দায়িত্ব এবং সার্বিকভাবে এটা কর্তব্য বলেও আমি মনে করি।

এ পর্যায়ে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন দেশবাসীর সামনে কিছু কথা রাখতে চায়। তা হচ্ছে– আমি প্রথমে যেমন বলেছি, এ জাতির জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন, স্বাধীনতার পর থেকে এ জাতি কোনো আদর্শ পায়নি, আদর্শের বিকৃতি পেয়েছে, আদর্শের নির্যাতন পেয়েছে, আদর্শের অত্যাচার পেয়েছে। আদর্শ নামক সমাজতন্ত্রের চরম জুলুম এদেশের মানুষকে সইতে হয়েছে। কারণ সমাজতন্ত্র আদতেই কোনো কল্যাণকর আদর্শ নয়। অনুরূপভাবে আর্থিক উন্নয়নের নামে পুঁজিবাদের লুণ্ঠন পেয়েছে; কারণ পুঁজিবাদ তৈরিই হয়েছে মানুষকে লুণ্ঠন করার জন্য। আসলে আমরা যে মুসলমান, আমাদের মধ্যে এ চেতনার জাগরণটা খুবই দরকার। আমরা যে কালেমা লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহর প্রতি ঈমানদার এটা আমাদের কী করতে বলে? এ কালেমা কিন্তু একটি আদর্শের কথা বলে– একটি আদর্শের পথনির্দেশ করে– সেটা হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান পালন করা। একমাত্র আল্লাহর সামনে মাথা নত করা এবং তাঁরই আনুগত্য স্বীকারের মাধ্যমে তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করে নেয়া–অন্য কারো নয়। তাই যদি হয়, তা হলে আমাদের উপরে মানুষের মনগড়া যে সব আইন-কানুন চালু আছে– সেগুলোকে কী করতে হবে? সেগুলোকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে এবং তদস্থলে কালেমা অনুযায়ী আইন-কানুন চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি তা না পারি তবে যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে থাকবে– এর থেকে আর পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। ফলে মুসলমান হয়েও আমরা মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারব না।

আমি আপনাদের সকলের প্রতি আহ্বান জানাবো, আসুন! আমরা ইসলামকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি, আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করি– নিছক ধর্ম হিসেবে নয়। আমরা ধর্ম হিসেবে তো ইসলাম পালন করি; কিন্তু শুধু ধর্ম হিসেবে তো ইসলাম আসেনি। ইসলাম এসেছে এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে। তাই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবেই তা মুসলমানদের নিকট গৃহীত হওয়া দরকার এবং মুসলিম জাতির জীবনকে সর্বতোভাবে সে অনুযায়ী গড়ে তোলা দরকার।

ইদানীং জনগণের মাঝে ওয়াজ-নসিহত খুব হচ্ছে, তাবলীগের কাজও হচ্ছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার চেতনাটা একেবারে মরে গেছে। মুসলমান হিসেবে আমরা যে অন্য কোনো দ্বীন-আদর্শকে গ্রহণ করতে পারি না, অন্য কোনো আইন-শাসনকে মেনে নিতে পারি না; কোনো মানুষের প্রভুত্ব-কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে পারি না এক আল্লাহ ছাড়া এবং রাসূলে করীম (সা.)-এর নেতৃত্ব ছাড়া অন্য কোনো মানুষের নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে পারি না এ কথাটি আজ সকলের মাঝে চেতনা হিসেবে আসা উচিত।

বিগত বছরগুলোতে এদেশে ক্ষমতার যে হাত বদল ঘটেছে তাতে একটি সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে শেখ মুজিবের হাত থেকে খন্দকার মোশতাকের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। তারপর আরেকটি বিপ্লবের ফসল হিসেবে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। পরবর্তীকালে এক ইলেকশনে তিনি প্রেসিডেন্ট

নির্বাচিত হন। তারপর আর এক বিপ্লব তাকে হত্যা করে। তারপর আসেন বিচারপতির সাত্তার সাহেব। নতুন ইলেকশন হলে তিনিও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তারপর তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিল আর এক সামরিক বিপ্লব। এভাবে দেশে একের পর এক ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে; কিন্তু এর সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অধিকাংশ পরিবর্তন সামরিক বাহিনীর লোকেরাই করেছে। যদি এ রকমই হতে থাকে তাহলে জনগণের কোনো কল্যাণ হবে না। যারাই পরিবর্তন করবে তারা তাদের নিজেদেরই স্বার্থ উদ্ধার করবে, তাদের মনগড়া নীতিই এখানে চালু করবে। ফলে জনগণের স্বার্থ বা বক্তব্য এখানে আর থাকবে না। জনগণ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে, তাদের বলার কিছু থাকবে না? এদেশের অধিকাংশ মানুষের চেতনার প্রতীক যে দ্বীন ইসলাম, তদনুযায়ী দেশ চলবে না, সমাজ চলবে না, রাষ্ট্র চলবে না। এ পরিস্থিতি আর চলতে দেয়া যায় না। এক একজন ক্ষমতায় আসবে আর জাতির উপরে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিয়ে বলবে, সব সুখ-শান্তি আমিই দিতে পারি। অতএব আমি যা বলি সবাইকে তা-ই মানতে হবে, এর বাইরে যাওয়া যাবে না– এও এক ধরনের জুলুম, যা আমাদের ওপর চলছে বছরের পর বছর ধরে।

আজ আমি বাংলাদেশের মুসলিম জনতার কাছে, বিশেষত আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমার জীবনের অভিজ্ঞতাসহ অনেক কথাই ব্যক্ত করেছি। আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, মানুষের মৌলিক অধিকাংশ যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিয়েছেন, তা আমরা কতটুকু ভোগ করতে পারছি। যদি না পেরে থাকি, তবে তা কেনো পারছি না সকলের ভেবে দেখা দরকার। আমার যা মৌলিক অধিকার তা থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখা কি জুলুম নয়? এই জুলুমবাজদের হাত থেকে বাঁচার পন্থা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। অতএব আল্লাহর দেয়া ইলমের ভিত্তিতে তাঁকে হাজির নাজির জেনে, তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমান এনে আজকে আমাদের পরিস্থিতি বুঝতে হবে– বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এরই মধ্য দিয়ে আমাদের কর্মপন্থা বের করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা হলো ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ـ

যে জাতি তার অবস্থা পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় না সে জাতির অবস্থা আল্লাহও পরিবর্তন করেন না। (সূরা রাআদ ঃ ১১)

আল্লাহ তা'আলার এ বক্তব্য অনুযায়ী আমাদের নিজদের অবস্থার পরিবর্তন, সমাজের পরিবর্তন তথা রাষ্ট্রের পরিবর্তন যদি আনতে চাই, তবে তা আমাদের নিজেদের উদ্যোগে করতে হবে, তবেই এখানে পরিবর্তন আসবে; অন্যথায় আসবে না, কেউ তা এনে দেবে না। এ বিষয়টি যতই বিচার-বিশ্লেষণ করবেন আমি জোর করে বলতে পারি, ততই এর যৌক্তিকতা আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হবে। এ জন্যে দেশের মুসলিম জনতাকে জাগ্রত করা, তাদের সচেতন করা ছাড়া আমাদের মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পন্থা-পদ্ধতি নেই।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা ধোঁকাবাজ হতে পারে, প্রতারক হতে পারে, ওয়াদা খেলাপি হতে পারে; কিন্তু সাধারণ মুসলিম জনগণ, যাদের অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, তারা ইসলাম ছাড়া কিছুই বোঝে না। তাদের কাছ থেকে ভোট নিতে গেলে কিংবা অন্য কোনো কিছু করতে চাইলে ইসলামের দোহাই দিতেই হবে। পাকিস্তান আমলে ছয় দফার পক্ষে ভোট নেয়া হয়েছিল এই বলে যে, কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাশ করা হবে না। এটুকু ওয়াদা তাদেরকে দিতে হয়েছে বলেই জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। তারা ইসলামের পক্ষেই আছে, তার বিপক্ষে নয়– এভাবে মানুষকে বোঝাতে হয়েছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলামের পক্ষে ছিল না, ইনসাফের পক্ষে ছিল না। যদি থাকত তবে তাদের হাতে যখন ক্ষমতা এসেছিল তখন তারা একটা ইনসাফপূর্ণ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ দেশবাসীকে উপহার দিতে পারত। কিন্তু এতো রক্তারক্তির পরেও এদেশের জনগণ কী পেল? যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দেশ স্বাধীন করা হলো সে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি কি এদেশের জনগণের ভাগ্য জুটেছে? বিগত বছরগুলোতে গরিব কি আরও গরিব হয়নি, ধনী কি আরও ধনী হয়নি? কাজেই মানুষের তৈরি কোনো মতবাদ যতো চমকপ্রদই হোক না কেন মানুষকে সুখ দিতে পারে না, স্বস্তি দিতে পারে না। এ কথাটি আজ জাতির সামনে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

## কর্মীদের প্রতি কিছু উপদেশ

আজকের এ অধিবেশনে আমাদের যে কর্মী ভাইয়েরা উপস্থিত আছেন তাদের প্রতি আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনাদের সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আজ ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে, তাদেরকে সাথে নিতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। মনে রাখবেন, এদেশের মুসলমানরা ইসলামের প্রতি অত্যন্ত দরদী, তারা আলেমদেরকে ভালোবাসেন, তাদেরকে যদি বুঝানো যায় তাহলে তারা অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠবেন। আর এ সচেতনতা আনতে হবে আপনাদের নেতৃত্ব দ্বারা। সে নেতৃত্ব শুধু ওয়াজের কিংবা দাওয়াত খাওয়ার নয় অথবা হাত পেতে খয়রাত নেবার নেতৃত্বও নয়। আলেমদের নেতৃত্ব শুধু জানাযা কিংবা ইমামতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এগুলোও করবেন– এ সবেরও দরকার আছে মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জন্য। আপনাদের দাওয়াত করলে যাবেন, দাওয়াতও খেতে হবে; কিন্তু দাওয়াতটা কিসের জন্য? আপনার স্বাদের জিনিসটি ওখানে রান্না হবে এ জন্য, তা যেন না হয়। একজন গরিব মানুষও যদি আপনাকে দাওয়াত করে তবে তার সেখানেও যাবেন; কারণ তার সাথে একাত্মতার প্রয়োজন আছে। তাকে আপনার সঙ্গী করে নিতে হবে, আপনার বন্ধু করে নিতে হবে।

আপনাদেরকে লোকদের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে মিশতে হবে এবং সাথে সাথে তৌহিদের দাওয়াত দিতে হবে। লোকদেরকে বলতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ ও প্রভু নেই। আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইন আমরা মানতে পারি না; যদি স্বেচ্ছায় এসব মানব রচিত আইন মানি তবে শিরকের মতো বড় অপরাধ হবে এবং আমাদেরকে মুশরিক হয়ে মরতে হবে। তাই আল্লাহ ছাড়া কারো কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব মানা আমাদের তৌহিদী ঈমানের পরিপন্থী। এতে আমাদের ঈমানের সম্পূর্ণ খেলাপ হয়ে যাবে। তাই আসুন, এগুলোকে পরিহার করি। এভাবে লোকদেরকে জাগ্রত করতে হবে, তাদের সাথে একাত্ম হতে হবে, তাদের আপন জন হতে হবে, তাদের দুঃখের দরদী হতে হবে, বিপদের সাথী হতে হবে, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। তারা যদি বুঝে যে, আপনি তাদেরই একজন সঠিক বন্ধু, তাহলে তারা আপনার কথা শুনবে।

অধিবেশনের শেষ পর্যায় আমি বলতে চাই যে, আমাদেরকে ইসলামী চেতনা-ভিত্তিক "গণঅভ্যুত্থান" ঘটাতে হবে। সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে জিহাদ ও শাহাদাত এ দু'টি স্তর পার হতে হবে। কিন্তু সেটা আপনি, আমি কিংবা

দশ-বারোটি লোক দ্বারা হবে না। যতদূর সম্ভব গোটা জাতিকে সেদিকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তার জন্য দরকার একটা চরিত্র। জনগণের সামনে আছে যে, তারা দাওয়াত খায় আর ওয়াজ করে। তারা ভালো-মন্দ বা অন্যায়ের খুব একটা পার্থক্য করে না। এই কিছদিন আগে মাদ্রাসার মুদাররেসিনরা একটা ভালো নমুনা দেখিয়েছেন। যে দিকে বেশি বেনিফিট দেখে তারা সেদিকে দৌড়ায়। এমনকি ফ্যামিলি প্লানিং-এর মতো একটি খারাপ জিনিসকেও তারা হালাল প্রমাণ করতে কসূর করে নি। এর বিরুদ্ধে তারা টু-শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

যা হোক, আজ সকলকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করতে হবে কাঙ্ক্ষিত সেই গণঅভ্যুত্থান ঘটানোর লক্ষ্যে। এটা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে করতে হবে। আমার (আবদুর রহীমের) কাছে কিংবা হাফেজ্জী হুজুরের কাছে শপথ নেবার দরকার নেই। আল্লাহর সাথে আপনি নিজে কথা বলুন; কেননা আপনার ঈমান আল্লাহর প্রতি। আপনি তাকেই বলুন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা, আমার জীবনের লক্ষ্য তোমার দ্বীন কায়েম করা; সেজন্য চেষ্টা করা, জিহাদ করা– প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, এবং এর ওপরে আমাকে কায়েম রেখো। আমি যেন কখনও নিজকে এর থেকে বাইরে না রাখি। হে আল্লাহ! এর ওপর আমাকে অটল থাকতে সাহায্য করো। কুরআন মজীদের ভাষায় এই অঙ্গীকার– এই প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় মিসাক্কা– আপনি এই মীসাক্কা করুন আল্লাহর কাছে।" এর সাথে সাথে কিছু প্রক্রিয়াও অবলম্বন করতে হবে যা আমি ইতঃপূর্বে আপনাদের নিকট বলেছি।

এ দেশের মানুষের ইতিহাস আপনারা জানেন। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও খুবই সাদাসিধে; এদেরকে সঙ্গে নেয়া অর্থাৎ সংগঠিত করা খুব কঠিন নয়। আপনি যদি বাস্তবিকই তাদের দরদী বলে আস্থা অর্জন করতে পারেন, সেই সঙ্গে আপনি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হন, আপনি তাদের ভুল পথে নিয়ে যাবেন না, আপনি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না; আপনি যা করবেন তাতে তাদের কল্যাণ হবে, এ ধরনের বিশ্বাস যদি আপনার প্রতি জন্মে তবে নিশ্চয়ই জনগণ আপনার সাথে আসবে। মনে রাখবেন, আমাদের লক্ষ্য হবে দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি কায়েম করা এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন– এছাড়া আর কিছু নয়।

আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গে নিয়ে আমি আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই। তা হচ্ছে ইদানীং ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেও নেতৃত্বের একটা মোহ জন্মেছে। কিছু লোক কাজের চেয়ে নেতৃত্ব নিয়েই বেশি মাথা ঘামাচ্ছে। এটা ঠিক নয়; এতে যে কোনো সংগঠনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নেতৃত্ব যদি কোনো এক পর্যায়ে এসে যায় সেটা ভিন্ন কথা; কিন্তু নিজকে কেউ নেতা বানানোর প্রতিযোগিতায় কখনও লিপ্ত হবেন না। এরূপ কাজের অর্থ হলো যে, আপনি ইসলামকে প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আপনার স্থান কোথায় এটা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ– আপনি নিজে করবেন না। আপনাদের প্রতি অনুরোধ যে কাজই করবেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবেন। এভাবে নিয়তকে খালেস করে আপনাদের কাজ করতে হবে।

এ দেশে যারাই আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে চায়, আজ হোক, কাল হোক কোনো না কোনো সময়ে তাদেরকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে পারব ইনশাআল্লাহ; এ বিশ্বাস আমার আছে। আর সঠিক আওয়াজ যদি বুলন্দ করা যায়, এদেশের উলামায়ে কেরামও আপনাদের সাথে থাকবে। কেননা এমন এক দাওয়াত– এমন এক আহ্বান– যে আহ্বানকে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহর এ দ্বীন আল্লাহর এ জমিনে কায়েম হবে নয় তো কার দ্বীন কায়েম হবে? এখানে মানুষের রচিত মনগড়া মতবাদ কায়েম হবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবি করে? আমাদের মধ্যে যদি বাস্তবিকই ঈমান থেকে থাকে তবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে। নানা দলের নানা দফা আমরা বুঝি না। আমরা বুঝি এক দফা– ইন্নাদদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু আমরা বুঝি না। আমরা জানি, একই বিধান একই হুকুম– ইনিল হুকমু ইল্লালিল্লাহ আমারা আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়্যাহু। আমরা জানি, এক নেতা– মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাড়া আর কাউকে নেতা হিসেবে মানি না। তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলো, বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং চিরস্থায়ীভাবে যারা ক্ষমতায় বসার জন্য ব্যস্ত তাদের কারোর হুকুম মানুষের ওপর চলতে পারে না– চলতে দেয়া যায় না।

অবশ্য ক্ষমতা এমনই এক মোহ যে, একবার কেউ ওখানে গেলে সহজে আর ছেড়ে দিতে চায় না– যতক্ষণ না তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেয়া

হয়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৫৮ সনে সামরিক শাসনকালের কথা, প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খান। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ছিল তখন পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা। মার্শল 'ল' দিয়ে সব ক্ষমতা মির্জা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়েছিল। ইস্কান্দার মির্জার স্ত্রী নাহিদ মির্জা একদিন বিকেলবেলা মহিলাদের এক বিরাট সভা ডেকে বললেন, আমাদের অন্তত দশ বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এ উপলক্ষে তারা একটা পার্টি দিল। সেখানে গান-বাজনা আর আনন্দ-ফূর্তি করে সবাই বাড়িতে গিয়ে উঠল। রাত বারোটার পরে আইয়ুব খান, আজম খান ও বার্কীসহ আরও তিন-চারজনকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, যান, মির্জা সাহেবকে গিয়ে বলুন, আজ রাতেই তাকে দেশ ত্যাগ করতে হবে; আজই তার ক্ষমতা শেষ। এমনই নিদর্শন আমাদের সামনে আরো বহু রয়েছে।

তাই আমরা চাই, আমাদের ওপর যে গায়রুল্লাহ্‌র হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা না নিস্তনাবুদ হয়ে যাক। আমরা সকলে যেন অ-খোদার শাসন থেকে, তাদের গোলামী থেকে মুক্ত হই এবং কেবল আল্লাহর গোলাম হয়ে দুনিয়ায় জীবন-যাপন করি।

## আলেমদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

আপনারা যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছেন বা শেষ পর্যায়ে রয়েছেন তাদের প্রতি আমার কিছু উপদেশ থাকবে। সেটা হলো, আপনাদের ইলম হাসিল করতে হবে প্রধানত কুরআন ও হাদিস থেকে। রাসূলে করীম (সা.)-এর সীরাত হলো কুরআন মজীদের বাস্তব রূপ; তাই তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বুঝতে হবে। অন্যদিকে বাংলা ভাষা সম্পর্কে আপনাদের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা মাদ্রাসার ছাত্রদের একটি দুর্নাম আছে যে, তারা ভালো বাংলা জানে না। অথচ বাংলা ভাষা হলো আমাদের প্রকাশ মাধ্যম– আমাদের মাতৃভাষা; বক্তৃতা করার জন্যও ভালো বাংলা জানতে হয়। ভুল বাংলায় বললে লোকেরা হাসবে ও বলবে, মোল্লা কিছুই জানে না– বাংলা ভাষাটাও ভালো করে বলতে পারে না।

উপরন্তু যাদের মাঝে লেখালেখির প্রতিভা আছে তারা লিখতে চেষ্টা করবেন। লেখার মাধ্যমে আপনারা ইসলামের খিদমত করতে পারেন। এভাবে মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সহজ হবে। তবে সেজন্য সাহিত্যিক মানের বাংলা ভাষা আপনাকে জানতে হবে। আসলে এ সব কিছুই অর্জন করার জিনিস। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করলে ও সাধনা করলে আপনারা এটা অর্জন করতে পারবেন। সেজন্য মূল কুরআন ও হাদীসকে সামনে রেখে সর্বমুখী পড়াশুনা করা দরকার। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান না জানা কিন্তু আলেম সমাজের একটা বিরাট কলঙ্ক; এ কলঙ্ক থেকে তাদের মুক্ত হতে হবে।

আজকের এ দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে যে জিনিসটি আমি বোঝাতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে ঃ আমরা মুসলমান– ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু সে অনুযায়ী আমাদের কোনো কিছুই চলছে না। অর্থাৎ আমাদের যা হক, আমাদের যা পাওনা, তা আমাদের দেয়া হচ্ছে না। কে বা কারা আমাদের দিচ্ছে না? যারা বছরের পর বছর ধরে ক্ষমতা ভোগ করছে তারা দিচ্ছে না। তাই এটা জুলুম। এ জুলুম থেকে এ দেশবাসী এবং আমাদের নিজদেরকে বাঁচাতে হবে। বছরের পর বছর ধরে আমাদের হক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে; এভাবে চলতে দেয়া যায় না। তাই আমাদের বক্তব্য হলো আমাদের হক নিজেদেরই আদায় করে নিতে হবে। সেজন্য এ বাংলাদেশের জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে সমস্ত ভয়-ভীতির উর্ধ্বে উঠে কাজ করে যেতে হবে। কেবল আল্লাহকে ভয় করে– পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এই ঈমান রেখে এ জমিনে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

আমরা এদেশের আলেম সমাজ বলতে গেলে খুবই গরিব লোক। তেমনি আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতও নই। বেশি চালাকি, বেশি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা ধন-সম্পদ আমাদের নেই। তাই বোধ হয় অনেক কিছু আমরা করতে পারি না। কিন্তু একটি জিনিস তো নিশ্চয়ই আমাদের আছে; সেটা হলো আমাদের এ জীবনটা। এ জীবনটা দিয়েও তো আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করতে পারি। এ সিদ্ধান্তে যদি আমাদের শাহাদাতের প্রশ্ন আসে তবে তার জন্য তৈরি থাকতে হবে। কেননা ইসলামের সাফল্যের জন্য শাহাদাত একটি অনিবার্য পর্যায়। ইসলামের গোটা ইতিহাসই শাহাদাতের ঘটনায় ভরপুর কাজেই যার তকদিরে আল্লাহ তা'আলা শাহাদাতের মর্যাদা লিখেছেন তিনি শহীদ হয়ে

যাবেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে– অনেক জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে। সে কারণে সাফল্য এসেছে, সে ইতিহাস আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। সেই ইতিহাস আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

ভয় কাউকে করার দরকার নেই– এক আল্লাহ ছাড়া। জেল-ফাঁসি কোনো কিছুকেই ভয় করার দরকার নেই। মনে রাখবেন, আল্লাহর সামনে এরা একটা পিঁপড়ার চাইতেও অক্ষম। কাজেই আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাব, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক হয়ে– ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে বাংলার জমিনে দ্বীনের ঝাণ্ডা উত্তোলনের জন্য নির্ভীক চিত্তে কাজ করে যান। আল্লাহ অবশ্যই মজলুম ও মাহরুমদের সাথে থাকবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে তার দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন।

---

## টীকা

১. এরপর ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০14 ও ২০1৮ সনেও নির্বাচন হয়েছে, যার পরিণতিতে দেশের সার্বিক অবস্থা প্রায় একই রূপ রয়েছে। ক্ষমতার হাত বদল ছাড়া দেশে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসেনি।

২. প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র লিখেছেন : স্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমানে ফুটবল ম্যাচ (শ্রীকান্ত, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)। এ বক্তব্য দ্বারা তিনি যে 'বাঙালি' দ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়কেই বুঝিয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৩. এ বক্তব্যটা রাখা হয়েছে এরশাদের স্বৈর-শাসনকালে। এর পরবর্তীকালেও প্রায় একই পরিস্থিতি চলে আসছে পূর্ববর্তী ধারা বহাল থাকার কারণে।

৪ স্মর্তব্য যে, এ কথাটি বলা হয়েছে আশির দশকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে। – সম্পাদক

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৮৫/১-এ (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।